আমার কাল আমার চিন্তা
(চাকরি জীবন : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, দুর্নীতি দমন ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক)
শাহ আবদুল হান্নান

চাকরি জীবন

আমার সিভিল সার্ভিস জীবন শুরু হয় ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে। আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেই ১৯৬২ সালে। ৬৩ সালের শুরুতে রেজাল্ট হয়। আমার সিভিল সার্ভিসে যোগদানের বিষয়টি ছিল খুবই কাকতলীয়। আমি নিজে কেন জানি এই পরীক্ষা দেয়ার জন্য খুব একটা সিরিয়াস ছিলাম না। আমার মনে আছে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার যে বিজ্ঞপ্তি তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সেটা আমি ভালো করে দেখিওনি। আমার আব্বা বিজ্ঞপ্তির কাটিং কেটে সেটা দেখান এবং আমাকে অনেকটা বাধ্য করেন পরীক্ষা দিতে।

আমি পরীক্ষা দিলাম। শুধু একটি বিষয় ছাড়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভালো করেছিলাম। সেটা ছিল ইন্টারন্যাশনাল ল’। তা না হলে সারাদেশের প্রথম কয়েকজনের মধ্যেই আমি থাকতাম যদি আমার সেই পরীক্ষাটি খারাপ না হতো। ইন্টারন্যাশনাল ল' আমি নিয়েছিলাম কারণ আমি এ বিষয়ে খুব ভালো ছিলাম এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে আমি এ বিষয়ে পড়েছিলাম। আমি আশা করেছিলাম এ বিষয়টিতে খুব ভালো করব এবং সেটাই হবার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ঐ বছর এ পেপারের যে প্রশ্নপত্র হয়েছিল সেটা একেবারেই সিলেবাস বহির্ভূত ছিল। একেবারেই নতুন ধরনের হয়েছিল। যার ফলে ঐ বছর যারাই ইন্টারন্যাশনাল ল' নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের প্রায় সকলেই ফেল করে যায়। কিন্তু আমি আমার সার্বিক পড়াশুনার কারণে এবং আন্তর্জাতিক ল' খুব ভালো জানা থাকার কারণে কোনোরকমে পার হয়ে যাই। মনে পড়ে, ৪৩ পেয়েছিলাম যেখানে ৮০ পাওয়া উচিত ছিল। আমার দুর্ভাগ্য, যদি আমি কাঙ্ক্ষিত নম্বর পেতাম তাহলে সারাদেশের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় হওয়া আমার জন্য অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু সেটা হয়নি, আমি সারাদেশে ৫২তম স্থান পাই। পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে বিশতম স্থান পাই।

এর ফলে আমি পাকিস্তান ফাইন্যান্স সার্ভিস বা পাকিস্তান কাস্টমস সার্ভিস পাই। ফাইন্যান্স সার্ভিস কয়েকটি সার্ভিস নিয়ে গঠিত। তার মধ্যে একটি হলো পাকিস্তান কাস্টমস সার্ভিস। খুব মন খারাপ করেই আমি ১৯৬৩ সনের ১৯শে নভেম্বর ঢাকা থেকে লাহোরে পৌঁছাই এবং ফাইন্যান্স সার্ভিস একাডেমীতে যোগদান করি।

আমি যেহেতু ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মী ছিলাম এবং ইসলামের যে পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আমার ভিতর আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে তার ভিত্তি ছিল মাওলানা মওদূদীর লিটারেচার সে কারণে মনে করলাম লাহোরে ট্রেনিং একাডেমীতে যোগদান করার পূর্বে আমি মাওলানা মওদূদীর বাসস্থানে যাব এবং উনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। তারপর একাডেমীতে যোগদান করব। আবার একই শহরে উনার বাসস্থান ও আমার ট্রেনিং একাডেমী হওয়াতে আমি এই সিদ্ধান্ত নেই। আমি পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্স (পিআইএ) বিমানের একটি ফ্লাইটে লাহোরে পৌঁছালাম। বিমান বন্দরটি ছোট্ট ছিল। একটাই বিল্ডিং। পরবর্তীতে ২০০০ সালে আমি যখন লাহোর যাই দেখি সেই বিমান বন্দর এখন আর সেরকম নাই, তার থেকে অনেক বড় হয়েছে। আমি সেখানে নেমে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। তখন লাহোরে ট্যাক্সি ছিল। ট্যাক্সি নিয়ে মওলানা মওদূদীর বাসস্থান ও জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিসে রাতে পৌঁছালাম। স্থানটি লাহোরের একটি মহল্লা ইছারাতে অবস্থিত। সেখানে মাওলানা মওদূদীসহ জামায়াতে ইসলামীর কিছু নেতৃস্থানীয় লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। উনাকে আমি আমার আসার কারণ জানালাম। পরে ইয়াকুব তাহের নামে একজন সিনিয়র নেতা আমাকে একাডেমীতে পৌঁছে দেন।

ফাইন্যান্স সার্ভিস একাডেমী

একাডেমীতে আমি নভেম্বর টু নভেম্বর, প্রায় এক বছর ছিলাম। সে সময় আমি একটা পরীক্ষাও দিয়েছিলাম। সেটা পাসিং আউট পরীক্ষা ছিল। লাহোর একাডেমী খুবই ছিমছাম একটা একাডেমী। অত্যন্ত সুন্দর। প্রায় পঞ্চাশ একর জমির উপর অবস্থিত হবে। তার কেন্দ্রস্থলে আমাদের বিল্ডিং ছিল। সেখানে অবারিত মাঠ ছিল। টেনিস খেলার ব্যবস্থা ছিল। সুইমিং পুল ছিল। আরো অন্যান্য ব্যবস্থাও ছিল।

আমি টেনিস খেলা ভালো করে সেখানেই শিখি। ভালো টেনিস খেলতে পারতাম। একবার প্রতিযোগিতায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে প্রায় ত্রিশজনের মধ্যে তৃতীয় হই। তখনকার সময় পূর্ব পাকিস্তানের ছেলেরা টেনিস খেলা তেমন জানত না। একাডেমীতে যে সমস্ত শিক্ষক ছিলেন তারা সবাই যোগ্য শিক্ষকই ছিলেন। এর মধ্যে একজন ছিলেন এম এ হানিফ। তিনি আমাদের অর্থনীতি পড়াতেন। এর দু'বছর পরই তিনি বরিশাল বিএম কলেজে চলে আসেন এবং পরে সেখানকার প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন। তিনি একজন সৎলোক ছিলেন। কিন্তু একাডেমীর ছাত্রদের কাছে কেন যেন মনে হতো তিনি ভালো পড়াতে পারতেন না। ফলে তিনিও ভালো সহযোগিতা পেতেন না। তবে তার সাথে কেউ কখনো খারাপ আচরণ কিংবা বেয়াদবী করেনি। তবে ছাত্ররা সবখানে টিচারদের যেভাবে লেগ পুলিং করে থাকে সেটা অবশ্য করেছে। আর সেখানে তো সবাই সিনিয়র ছাত্র। একেকজন একেক জায়গা থেকে ফার্স্ট হয়ে এসেছে। ফলে তারা সাধারণ ছাত্রও নয়, প্রত্যেকে নিজের জায়গায় অলরেডি স্কলার। কাজেই লেগ পুলিং যে কিছু করা হতো না তা নয়। তাকেও করা হতো। অন্যদেরও করা হতো। আবার উচ্চারণগত দিক থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটু ভিন্নতাও লেগ পুলিংয়ের একটা কারণ ছিল।

আমাদের পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন যিনি পড়াতেন তিনি খুবই ভদ্র লোক ছিলেন। উনার নাম ভুলে গেছি। সিন্ধুর লোক ছিলেন। মধ্য বয়সী। পরবর্তীতে শুনেছি তিনি সিন্ধু ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। তার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। আমাদের অর্থনীতির সিনিয়র টিচার ছিলেন মি. বি. এ. আজহার। খুবই সিনিয়র অর্থনীতিবীদ। তিনি আমেরিকা থেকে পিএইচডি করা ছিলেন। একাডেমীর ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন। তিনি অর্থনীতি খুব ভালো পড়াতেন। ইসলামেরও ভক্ত ছিলেন। আমাদের কিছুটা ইসলামের কথা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করতেন। যদিও তখনো ইসলামী অর্থনীতির থিওরিটিক্যালি লিটারেচারের তেমন কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়নি যেটা পরবর্তীকালে হয়েছে। তবে তিনি যতটা বুঝতেন ইসলামী অর্থনীতির উপরও আমাদের ততটা বলার চেষ্টা করতেন। তার সাথে আমার ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আমি এসব কথা আরো বেশি করে আলোচনা করতে অনুরোধ করতাম। তিনি হ্যাঁ সূচক সম্মতি জানিয়ে বলতেন চেষ্টা করব আরেকটু ভালো করে বলার।

একাডেমীতে ফাইন্যান্স সার্ভিসের ক্যাডারদের মাস্টার্স লেভেলে পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও ইকোনোমিকস পড়তে হতো। একাউন্টিং পড়তে হতো গ্রাজুয়েশন লেভেলে। মি. হাশমী বলে এক শিক্ষক লাহোর গভর্মেন্ট কলেজে পড়াতেন। তিনি একাডেমীর স্টাফ ছিলেন না। তবে আমাদের একাউন্টিং পড়াতেন। তিনি একজন খুব যোগ্য শিক্ষক ছিলেন। মি. বাটলিবয় বলে এক লেখকের একটি একাউন্টিং বই তিনি পড়াতেন। ফলে আমাদের কেউ কেউ উনার নাম দিলেন বাটলিবয়। আমরাও তাকে মি. বাটলিবয় বলতাম।

লাহোর একাডেমীর জীবন আমাদের জন্য রোমাঞ্চকর ছিল। শুধু একটাই ইরিটেশন তখন ছিল, সেটা ছিল পূর্ব পশ্চিমের সম্পর্কের ব্যাপারে। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালো ছিল না। দুই অঞ্চলের বৈষম্যের কথা ব্যাপকভাবে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হতো। রাজনীতিতে আলোচিত হতো। পার্লামেন্টেও আলোচিত হতো। সেই হিসেবে সেটা আমাদের সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করত। যদিও সবাই জানত একাডেমীতে যারা পড়াশুনা করছে তাদের এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকা নাই কিন্তু তারপরও সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো একটু হলেও প্রভাব ফেলত। তবে সততার সাথে বলতেই হবে এক দুইজন ছাড়া সবাই সবার বন্ধু ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের দু'একজন ছিল যারা খুবই নাক উঁচু স্বভাবের। আবার পূর্ব পাকিস্তানেরও দু'একজন ছিল যারা খুবই আইসোলেশনিস্ট। তারা বিচ্ছিন্ন থাকা পছন্দ করত। এরকম কয়েকজনকে বাদ দিলে সবাই সবার বন্ধু ছিল। আবার দু'একজন ছিল যারা সবসময় উস্কাতে চেষ্টা করত - একদিকে দেখলে সেটা তো হয়েই থাকে। এছাড়া কারো কারো স্বভাবই এরকম।

ট্রেনিংয়ে থাকা অবস্থায় এর অংশ হিসেবে আমাদের একটা ট্রেন ভ্রমণ করতে হয়। যেটা লাহোর থেকে শুরু হতো। গোটা একাডেমীর স্টাফ, ছাত্র, পরিচালকগণ সবাই মিলে সে উদ্দেশ্য একটা ট্রেন আমাদের জন্য সম্পূর্ণ ভাড়া করে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশ ভ্রমণ করতে হয়। এ ভ্রমণে আমরা লাহোর থেকে রাওয়ালপিন্ডি গেলাম। সেখানে দু'তিন দিন থাকলাম। একনাগাড়ে প্রায় দশদিন আমাদের ট্রেনে কাটাতে হলো। রান্নাবান্না, খাওয়া দাওয়া সবই ট্রেনের ভিতর। এটাকে প্রাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ে একটা অংশ করা হয়েছে। সেটা ছিল দশদিনের একটা পিকনিকের মতো। এই ভ্রমণের মধ্যেই আমরা বিভিন্ন অফিস, ইন্ডাস্ট্রিজ, দর্শনীয় স্থানসমূহ সফর করি।

এই এক বছরের আমি লাহোর সম্পূর্ণটা দেখে নেই। বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে বিভিন্ন সিনিয়র সাংবাদিকের সাথে আমরা পরিচয় হয়। মিসাক বলে একটা পত্রিকা ছিল। একটা ছিল মাশারেক। সেখানে আমি যাই। সাংবাদিকদের সাথে আলাপ করি। ইসলামিক পাবলিকেশন্স বলে একটা পাবলিকেশন্স আছে সেটা পাকিস্তানের তৎকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ পাবলিশিং হাউস ছিল। তাদের অফিসে আমি কখনো কখনো গিয়েছি বই কিনতে আলাপ করতে। সালামার বাগ, বাদশাহী মসজিদ, জাহাঙ্গীরের মাববেরা (কবরস্থান), আল্লামা ইকবালের দাফনের স্থানসহ যত দর্শনীয় স্থান ছিল সব সেসময় দেখি। বাদশাহী মসজিদে ঈদের নামাজ পড়ি। দু'টি ঈদের নামাজ পেয়েছিলাম। মসজিদটি খুবই বিরাট।

একাডেমীতে থাকা অবস্থায় হঠাৎ করেই আমি একবার সিরিয়াস ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলাম। এতে পরীক্ষা দিতে প্রায় অসমর্থ হলাম। এর জন্য আমি পরবর্তী দুই তিন বছর খুবই কষ্ট পেয়েছি। পরীক্ষার মধ্যে এমন এক সময় ম্যালেরিয়া হলো মনে হলো আমি আর পরীক্ষাই দিতে পারব না। কিন্তু আমার মনে পড়ে সেখানে আমাদের এক ডাইরেক্টর আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তিনি বিষয়টি দেরিতে জেনেছিলেন। তিনি বিশেষ যত্ন নিয়ে হাসপাতালে পাঠান এবং পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন যাতে আমি পরীক্ষা দিতে পারি। আমি সেই পরীক্ষা দিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু আমার পরীক্ষা খারাপ হয়েছিল। ম্যালেরিয়ার কারণে আমার খারাপ ভাগ্যে পেয়ে বসে। পরীক্ষা ভালো হয়নি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ট্রেনিং শেষ করার পর আমি চট্টগ্রামে এসে এসিস্ট্যান্ট কালেক্টর অব কাস্টমস হিসাবে যোগদান করলাম। সেখানে কয়েক বছর ছিলাম। এর মধ্যে ঢাকায় কিছুদিন কাজ করলাম। ১৯৭২ সালে এসে আমি ঢাকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেকেন্ড সেক্রেটারি হিসেবে যোগদান করলাম। পাকিস্তান আমলে এর নাম ছিল সেন্ট্রাল বোর্ড অব রেভিনিউ। স্বাধীনতার পর এর নাম হলো ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ (এনবিআর)। এর নামকরণ করেছিলেন নুরুল ইসলাম সাহেব। তিনি তৎকালীন আমাদের সেক্রেটারি ছিলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হয়েছিলেন। তিনি সেক্রেটারি অব কমার্স ছিলেন। টিসিবির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং দুই তিন মাস এনবিআর-এর দায়িত্বে ছিলেন।

এনবিআর হবার পর প্রথম যে দু'জন অফিসার যোগ দেয় তার মধ্যে আমি একজন। একজন ছিলেন জনাব আহমদ আলী। তিনি ফার্স্ট সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করে গেছেন। তিনি কালেক্টর হয়ে রিটায়ার করেছিলেন। আর আমি হলাম ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউর প্রথম সেকেন্ড সেক্রেটারি। অর্থাৎ বলা যায় এনবিআর-এর সব প্রাথমিক কাজগুলো হয় আমার হাত দিয়ে। আমার পরে জয়েন করেন আমার এক বন্ধু মি. এস. এ. আকরাম, যিনি পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের টিকিটে নারায়ণগঞ্জ থেকে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। তিনি আমার ক্লাসমেটও ছিলেন।

আমর চাকরি জীবনের বেশিরভাগ সময় আমি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ছিলাম। প্রথমত ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ এর এপ্রিল পর্যন্ত এর দ্বিতীয় সচিব হিসেবে ছিলাম। পরবর্তীতে প্রথম সচিব হলাম। এই সময়টাই ছিল বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পুনর্গঠনের সময়। সেই পুনর্গঠনের কাজে আমাকে অনেক দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। সে সময় এনবিআর-এ খুব অভিজ্ঞ লোক ছিল না - যারা পাকিস্তান বোর্ড অব রেভিনিউ এ কাজ করেছে। কাজেই আমরা যখন নতুন করে এনবিআর-এর কাজ শুরু করি সে সময় যিনি প্রথমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন জনাব আবুল হোসেন, যিনি পরবর্তীতে এমপি হন এবং ২০০১ এর অক্টোবরের নির্বাচনের পর অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি একটা সময় এনবিআর এর প্রথম সচিব ছিলেন। তারপর তিনি কাস্টমস

হাউজ কালেক্টর হয়ে এনবিআর থেকে চলে গেলে আমি প্রথম সচিব হিসাবে এর দায়িত্ব গ্রহণ করি। দ্বিতীয় সচিব হিসেবে জনাব এস এম আকরাম ছিলেন যার কথা আমি পূর্বেই বলেছি।

এই সময় আমাদের সম্পূর্ণ নতুন করে কাজ শুরু করতে হয়। পাকিস্তান আমল থেকে পাওয়া পুরানো ব্যবস্থাকে আমরা রিভিউ করি এবং নতুন করে সাজাই। তখন বাংলাদেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিল। বিদেশ থেকে জাতিসংঘ টিমসহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন এনজিও এখানে কাজ করতে আসে। সব মিলিয়ে সে সময়গুলোতে বিভিন্ন ধরনের বিষয়াদি আমাদের সামনে এসে যায়। যেমন রিলিফের মালামালে উপর আমরা কি রকম সুবিধা দেব? এর জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব যাতে সেগুলো তাড়াতাড়ি ছাড়ানো যায়? আবার কোনটাকে আমরা রিলিফ হিসেবে গণ্য করব আর কোনটাকে রিলিফ হিসেবে গণ্য করব না? এরকম নতুন নতুন বিষয় আমাদের সামনে আসে। এসব প্রশ্ন, জটিলতার সমাধান আমাদের করতে হয়। আমরা একটি এসআরও ইস্যু করি। এসআরও অর্থ আইনভিত্তিক রুলস এন্ড অর্ডার (Statutory Rules and Orders)| এর মাধ্যমে এসব বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়।

সে সময় থেকে কূটনীতিকরা ব্যাপকভাবে এদেশে আসা শুরু করে। বিভিন্ন দেশের দূতাবাস খোলা হয়। যদিও জাতিসংঘের ডকুমেন্টে দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধা কেমন হবে সে সম্পর্কে বলা আছে এবং সেই সাথে অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রটোকল চুক্তিতে কূটনীতিকরা কি কি সুবিধা পাবে তা বলা আছে, কিন্তু তাতে অনেক অস্পষ্টতা ছিল। কূটনীতিকদের সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক চুক্তি আছে। কনভেনশন আছে। সেগুলো আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল না বলে সেগুলো সংগ্রহ করা, বোঝা, কার্যকর করা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় এসআরও বা নোটিফিকেশন ইস্যু সে সময় করা হয়েছিল। তা যথেষ্ট জটিল ছিল।

তখন রিফিফের অনেক কাজ হতো আমাদের বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও অবকাঠামোকে গড়ে তোলার জন্য। রাস্তাঘাট, পোর্ট ইত্যাদি গড়ে তোলার জন্য। সে সময় হাজার হাজার রিলিফ কর্মী এদেশে আসে। তারা কূটনীতিক নয়। কিন্তু তারা কি কি সুযোগ-সুবিধা পাবে? শুল্ক মুক্তভাবে কি পাবে? এই প্রশ্নগুলো আমাদের নির্ধারণ করতে হয়। আমরা এর জন্য অনেকগুলো এসআরও ইস্যু করি। নতুন একটি দেশের এনবিআরকে পুনর্গঠন করতে গিয়ে আমদের এ সমস্ত বিষয়গুলোর সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া রেভিনিউ কালেকশনের ব্যাপার তো ছিলই। আমরা কি ট্যাক্স করব আর কি ট্যাক্স করব না? কত পরিমাণে ট্যাক্স করব? আমাদের অভিজ্ঞতা কম ছিল। এসব কাজ প্রথমে দ্বিতীয় ও পরে প্রথম সচিব হিসাবে আমাকে এবং আমার সহকর্মীদের করতে হয়েছিল। উর্ধতন পর্যায়ে বা উপরের দিকে সাধারণত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম হয়। সে হিসেবে তারা আমাদের কাজের উপর সিদ্ধান্ত দিতেন।

আগেই বলেছি আমি আমার চাকরি জীবনের বেশির ভাগ সময় এনবিআরে কাটাই। মাঝখানে কিছু গ্যাপ দিয়ে আবার এনবিআরে ফিরে আসি। এর মধ্যে বাহিরে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টিং ছিল। ১৯৮৫ সাল এনবিআরে ফিরলেও কয়েক মাস থাকার পর একই বছর আবার চলে যাই ডিজি এন্ট্রি করাপশন হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে। আবার ১৯৮৭ সালে এনবিআরে আসার পর ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ছিলাম। ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে ও পুনরায় ১৯৮৭ সালে যখন এনবিআরে ফিরে আসি তখন এতে সদস্য হিসেবে যোগ দেই। ১৯৯২ সালে এনবিআর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে যোগ দেই। তারপর সচিব হিসাবে ব্যাংকিং বিভাগ ও সমাজকল্যাণ বিভাগে কাজ করার পর পরবর্তীতে আবার শেষবারের মতো ১৯৯৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে এনবিআরে ফিরে আসি। ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে আমি এনবিআর থেকে পদত্যাগ করে সরকার থেকে চলে আসি।

এটা হলো সংক্ষিপ্তভাবে এনবিআরের সাথে আমার যোগাযোগ। এ সময়গুলোতে আমি যেসব কাজ করেছি তা আলাদা করে উল্লেখ করব। এনবিআর এর বাইরে আমার চাকরি জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও আছে। তার কিছু কিছুই এখানে উল্লেখ থাকবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের সময়কাল

ফাইন্যান্স সার্ভিস থেকে এন্টি করাপশনের মহাপরিচালক হিসেবে আমার পোস্টিং হয় ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে। প্রায় দু'বছর আমি সেখানে ছিলাম। সেটাই ছিলাম কাস্টমস সার্ভিসের বাইরে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। ইতোমধ্যে আমি সদস্য হয়েছি, এডিশনাল সেক্রেটারির পদবি ধারণ করছি। সেখানে যোগ দিয়ে যার কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করলাম তিনি হলেন প্রখ্যাত উপন্যাসিক, সাহিত্যিক আবুল খায়ের মোসলেহ উদ্দিন। বিগত ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে তিনি মারা যান। তিনি অন্য খানে বদলী হয়ে চলে যান।

দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে কাজ করতে যেয়ে আমার বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। এখানে দুর্নীতির বিভিন্ন মামলা আসে। হাজার হাজার অভিযোগ আসে। সেসব আমাদেরকে তদন্ত করতে হয়। সেসব তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশকে যে ক্ষমতা দেয়া আছে ব্যুরো অব এন্টি করাপশনের অফিসাররা সেই একই ক্ষমতা ভোগ করে। Criminal Procedure Code বা সংক্ষেপে CRPC সিআরপিসির মাধমে পুলিশ অফিসাররা বিভিন্ন ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। সিআরপিসি বা দণ্ডবিধি আইনের আওতায় পুলিশ বিভাগ যেমন সকল মামলা তদন্ত করে ব্যুরোও সেভাবেই সেগুলো তদন্ত করে।

আমি যখন দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে যোগদান করি তখন এর নিজস্ব লোকবল খুব কমই ছিল। বেশিরভাগ অফিসারই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে ডেপুটেশনে এখানে আসত। এর হেড অফিস ছিল ঢাকায়। প্রত্যেক জেলায় একজন করে এন্টি করাপশন অফিসার ছিলেন। সেই সাথে বিভাগীয় দায়িত্বে ছিলেন ডেপুটি ডিরেক্টর পদমর্যাদার কর্মকর্তা। এখানে এসব বর্ণনায় চেয়ে এর অভিজ্ঞতাই আমার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমি লক্ষ্য করি এখানে অনেক বেনামী অভিযোগ আসে। লোকেরা সাধারণত স্ব-নামে অভিযোগ দিতে সাহস করত না। আমাদের একটা সুন্দর ও সঠিক নির্দেশনা ছিল কোনো বেনামী অভিযোগ নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে না যদি সেটা সুনির্দিষ্ট না হয়। যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ হয় তাহলে তা বেনামী হলেও তদন্ত করতে হবে। এটা সঠিক ছিল এই জন্যে যে স্ব-নামে অভিযোগ করলে আমাদের দেশে সাধারণত নানা ভয় ভীতি থাকে। আবার নামে অভিযোগ করা নানা কারণে সম্ভবও নয়। এটাও ঠিক যে তা যদি সুনির্দিষ্ট না হয় তাহলে তা করাও ঠিক না। কিন্তু নাম না দিয়ে বিষয় দিয়ে কখন, কোথায়, কিভাবে, কি কি হয়েছে, কারা কারা করেছে এরকম যে অভিযোগ তাকে তো আর অবহেলা করা যায় না। এটা ঠিক, কিন্তু আমার যে অভিজ্ঞতা তাতে আমি দেখেছি অভিযোগ আসত অনেক। এর বেশির ভাগই অনির্দিষ্ট ও শত্রুতামূলক। তিলকে তাল বানানো হতো। একেক জনের বিরুদ্ধে বিশ ত্রিশটি পর্যন্ত অভিযোগ করা হতো। আবার একই অভিযোগ পত্র কখনো কখনো অসংখ্য জায়গায় পাঠানো হতো।

আমাদের সমাজে দুর্নীতি বেশি। একদিকে অনিয়ম বেশি। আরেকদিকে মানুষের মন মানসিকতা হচ্ছে শত্রুতা পরায়ন এবং অন্যের পিছনে লেগে থাকার প্রবণতা লক্ষণীয়। আমাদের একে অন্যের বিরুদ্ধে খুব ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে অভিযোগ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের কাছে খুব ছোট বিষয় নিয়েও অভিযোগ করা হয়। এটা ছিল একটা দিক। দ্বিতীয় যে দিকটি আমি লক্ষ্য করলাম তাতে আমার মনে হয়েছিল দুর্নীতি দমন ব্যুরো খুবই দুর্নীতিগ্রস্ত একটা বিভাগ। তারা নিজেরাই বড় বড় করাপশন করছে বলে আমি লক্ষ্য করতাম এবং একই সঙ্গে ভীষণ অবাক হতাম। এর ফলে আমি আমার অফিসারদের এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে, নিজেদের হাতই যখন এতো কালো বলে মনে হয় তাহলে আমরা কেন এতো ছোটখাট জিনিস ধরছি। বড় জিনিসগুলোই ধরা আমাদের কর্তব্য, দেখা আমাদের কর্তব্য। তবুও তারা চাইতেন সকল ক্ষুদ্র বিষয় যেন আমরা তদন্ত করি। আর সেটা করার জন্য অনেক সময় কেস করা হতো, চাপ দেয়া হতো। কিন্তু দু'টি কারণে আমি এর পক্ষপাতি ছিলাম না। একটি কারণ ছিল, আমি সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা যদি অতি ছোটখাট বিষয়ে জড়িয়ে পড়ি তাহলে বড় কিছুই করতে পারব না। দ্বিতীয় কারণ হলো, আমি নিজে নিশ্চিত ছিলাম - এ বিভাগ নিজেই দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল। এদের কোনোই অধিকার নেই অন্য মানুষের কোনো ক্ষুদ্র ছিদ্রান্বেষণ করার।

ডিজি এন্টি করাপশন হিসাবে আমি কয়েক মাস পার করলাম। আস্তে আস্তে এর কাজ রপ্ত করলাম, বুঝতে থাকলাম। এ সময়ের মধ্যে এর আইনগুলো পড়ে নিলাম। তখন সিআরপিসি, পেনাল কোড, এভিডেন্স এ্যাক্ট, এন্টি করাপশন ম্যানুয়েল পড়ে ফেললাম। বিভিন্ন বিষয়, তাদের পদ্ধতিসমূহ বুঝে নিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম এখানে পুলিশের মতো ডেকে এনে অফিসের মধ্যে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা এন্টি করাপশনকে,

পুলিশকে সাংঘাতিক ভয় পায়। কাজেই আমি এটাকে খুবই অন্যায় মনে করতাম। সিআরপিসি'র ১৬১ ধারায় জবানবন্দী পুলিশকে তাদের কাছে গিয়ে নেয়া উচিত। ডেকে আনা মানে হলো তাকে তার অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে তার উপর চাপ সৃষ্টি করা। সেটাকে আমি সঠিক মনে করতাম না। এটা একটি ট্রাডিশনাল প্রসিডিউর ছিল এবং আমি একা তার বিরোধিতা করে কুলাতে পারতাম না। তবে ভবিষ্যতে এই পদ্ধতির পরিবর্তন হওয়া দরকার। সিআরপিসি গভীরভাবে নতুন করে দেখা দরকার।

যদিও আমি জানি আমাদের দেশের বেশির ভাগ ট্রাডিশিয়াল পুলিশ অফিসাররা যে কোনো কারণেই হোক বৃটিশ আইনের বড় ভক্ত - এর কারণ আমার মাথায় একদমই ঢোকে না। তারা মনে করে পেনাল কোড ঠিক আছে। সিআরপিসি, সিপিসি, এভিডেন্স এ্যাক্ট সব ঠিক আছে। তারা হয়ত ভাবে যে কোনো প্রকার সংশোধনই এই জিনিসটাকে নষ্ট করে দেবে। কিন্তু আমি কেন জানি মনে করি এটা আমরা বুঝতে ভুল করছি যে বৃটিশ শাসনের সময় যেগুলো তৈরি করা হয়েছিল তারা তাদের স্বার্থেই সেগুলো তৈরি করেছিল। একটা পরাধীন জাতিকে দমন করার জন্য নিপীড়নের জন্য তারা তা করেছিল। কিন্তু আমরা মানসিকভাবে এমন অধীন হয়ে গেছি যে এ কথাগুলো উপলব্ধি করি না। এসব আবার নতুন করে তৈরি করার দরকার। সংস্কার করার দরকার - সেটা আমরা করিনি। আমরা শুধু ছোটখাট সংশোধন করি যেটাতে পুরো কাজও হয় না। আমাদের এ মানসিকতা একদমই সঠিক নয়। আমি আমাদের বেশির ভাগ আইনজীবিদের এটা বুঝতে দেখিনি যে মানুষের বড় বড় সমস্যা হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে। তাদেরকে বর্তমান অবস্থাতে অর্থাৎ যেটা বৃটিশ থেকে পাওয়া তারই সমর্থক বলে লক্ষ্য করেছি।

যাই হোক, কয়েক মাসের মধ্যেই জিনিসটা বুঝে গেলাম। আমার সময় ব্যয় হতো প্রধানত লোকদের দুর্নীতি দমন করতে বা দুর্নীতি বন্ধ করার জন্যে এমন নয়। আমাকে বেশির ভাগ সময় ব্যয় করতে হয়েছিল আমার কিছু অফিসারের নিপীড়ন থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে। শত শত লোক স্ব-শরীরে আমার কাছে হাজিরা দিত কিংবা চিঠি দিত যার মাধ্যমে আমি জানতে পারতাম কিভাবে তাদের উপর অন্যায় করা হচ্ছে বা কিভাবে নির্যাতিত হবার ভয় তারা করছে। এর জন্য আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্ঠা করেছি যাতে এই নিপীড়ন থেকে তাদেরকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। আমিও যে পুরোপুরি সে কাজ করতে পেরেছি বা সক্ষম হয়েছি তাও নয়। কিন্তু তারপরও বলব, শত বিরোধীতা এখানে থাকলেও যখনই বুঝেছি যে, যেখানে যেখানে বাড়াবাড়ি আছে, আভ্যন্তরীণ সমস্যা আছে, অন্যায় আছে, অপরদিকে লোকগুলো নিরীহ - তখনই সেগুলো দূর করার চেষ্টা করেছি। নিরীহদের মুক্ত করার চেষ্টা করেছি। আমি তাদের পক্ষ হয়ে কাজ করেছি।

এমনও হয়েছে, দেখা গেছে কোনো ঘটনার মামলায় পাঁচশ জনকে আসামী করা হয়েছে। সেখানে খুব বেশি হলে পাঁচজনকে আসামী করা যায়। কিংবা যেখানে মাত্র পাঁচ সাতজনকেই আসামী করা যায় সেখানে আসামী করা হয়েছে শতাধিক ব্যক্তিকে। এর জন্য সেসব ক্ষেত্রে যারা প্রকৃত দোষী নয় তাদের নাম কাটাতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এবং এগুলো করতে গিয়ে এর বিরোধীতাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। আমাকে নোটের পর নোটে যুক্তি দিতে হতো কেন আমি এদের নাম কেটে দিচ্ছি। না হলে উল্টা আমার উপরই এই অভিযোগ হতে পারে যে পরবর্তীতে দুর্নীতি করে আমিই এদের ছাড়িয়ে দিয়েছি। কাজেই সেখানে সব সময় কঠিন বাস্তবতা কাজ করত। তবুও এ কাজটি আমি করেছিলাম।

এন্টি করাপশনে থাকাকালে একজন অফিসারের সাথে আমার সংকট দেখা দেয়। এরকম সংকট এই বিভাগের অন্যান্যদের পরস্পরের মধ্যে অনেক ছিল। তিনি আগে যেখানেই চাকরি করেছেন, যাদের সঙ্গেই তার মতবিরোধ হয়েছে, তিনি দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে এসেই তাদেরকে ঘায়েল করার চেষ্টা শুরু করলেন। তাদের বিরুদ্ধে একটা করে মামলা খাড়া করার চেষ্টা করলেন। এরকম প্রায় বিশ ত্রিশ জনের বিরুদ্ধে তিনি মামলা করে ফেললেন। যাদের বিরুদ্ধে তিনি এরকম মামলা করেছেন তারাই এসে আমাকে জানালো যে শুধুমাত্র প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য তিনি এ রকম মামলা করছেন। অভিযুক্তদের বক্তব্য শুনেও আমি নিজেই বুঝতে পারলাম যে এ সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। কিন্তু সে ব্যক্তি যেহেতু আইনের মাধ্যমে আগাতেন তাই তার নোটকে খণ্ডন না করে কিছু করারও ছিল না। এগুলোকে আমার বিবেচনায় নিতে হয়েছে। ফলে খুব সাবধানে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যতটুকু পেরেছি আইনের মাধ্যমে রক্ষার করার চেষ্টা করি। অনেককেই আমি এর ফলে রক্ষা করতে পেরেছি এবং অনেকেই এমন অবস্থার করে দিয়েছি যার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে আর কিছু করে উঠতে পারেনি।

সে অফিসারের স্বভাব ছিল সব ধরনের কূট নীতি প্রয়োগ করে লোকদেরকে হেনস্তা করা। এটা একেবারেই ব্যক্তিগতভাবে করা হতো। এমনকি দুঃখজনক হলেও সত্য তার সঙ্গে পাশের বাসার যদি ঝগড়া হয়েছে তার বিরুদ্ধেও তিনি মামলা করে দিয়েছেন। যারা তার অধীনে কাজ করছেন তাদের কথা মানেনি বা শোনেনি। তিনি তাদের বিরুদ্ধেও মামলা করে দিয়েছেন। তিনি তার বসদের বিরুদ্ধেও মামলা করে দিয়েছেন। এই ধরনের পরিস্থিতি তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে বোঝা যায়, সরকারের ভিতরে এ ধরনের কিছু লোক আছে, তাঁরা সত্যিকার অর্থেই নিরপেক্ষ নন। এটা আমার জীবনের অন্যতম একটা দুঃখজনক ঘটনা। এটা যেমন আমার দুর্ভাগ্য তেমনি এই অর্থে সৌভাগ্য যে আমি মানুষ চিনতে পেরেছিলাম। এতে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, এক অর্থে প্রশিক্ষণও।

এখানে থাকা অবস্থায় আরো দু'একটি অভিজ্ঞতা বলার মতো। পরবর্তীকালে আরেক জন ব্যক্তি যিনি প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনি ঐ সময় এক করপোরেশনের সিনিয়র অফিসার ছিলেন। তার এবং তার পরিবারের সাথে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে আমি তদন্ত শুরু করলাম। তখন রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে আমার কাছে টেলিফোন আসল কেন আমি তা তদন্ত করছি। আমি তাকে কারণগুলো বললাম। তিনি আমাকে কাগজপত্রগুলো নিয়ে তার সাথে পরের দিন দেখা করতে বললেন। আমি তার সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম। তিনি খুব বেশি ইন্টারফেয়ার করেননি। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম এটা নিয়ে আর বেশি অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে উচিত হবে না। আর যদি অগ্রসর হই তাহলে অন্য কোনো কাজই করতে পারব না। একটা কাজ করতে গিয়ে অন্য পঞ্চাশটি কাজ নষ্ট করব। ফলে সেসব দিক বিবেচনা করে আমি সাবধান হয়ে গেলাম।

সেসব ঘটনা কতটুকু সত্য ছিল তা বলা খুব মুশকিল। কিন্তু আমরা তা নিয়ে তদন্তের জন্য খুব বেশি দূর আগাইনি। এটা স্বীকার করি যে, আমি যে কয়টি বিষয় নিয়ে কাজ সম্পূর্ণ করতে পারিনি তার মধ্যে এটা একটা। কিছু কিছু ব্যক্তি আছে যেমন, তার মতো একজন একটি করপোরেশনের অফিসার রাষ্ট্রপতিকে প্রভাবিত করতে পারে সেটা ভাবতে অবাকই লাগে, যার অভিযোগে রাষ্ট্রপতি শুধু টেলিফোনই করেন না ডেকে নেন কাগজ দেখতে চান।

ডেপুটি গভর্নর : বাংলাদেশ ব্যাংক

আমার চাকরি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকে ডেপুটি গভর্নর এবং ব্যাংকিং সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৯২ সালে আমি হজ্বে যাই। হজ্ব থেকে ফেরার পথে জেদ্দা এয়ারপোর্টে আমি জানতে পারলাম আমার পোস্টিং হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকে ডেপুটি গভর্নর হিসেবে। এই খবরে বলা যায় আমি খুব ক্ষেপে যাই। কারণ কথা ছিল তখন আমাকে সচিব করা হবে। কিন্তু সচিব না করে করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর। তাই তখন মনে মনে নিয়ত করেছিলাম জয়েন করব না।

জেদ্দা থেকে ঢাকা এয়ারপোর্টে পৌঁছা মাত্রই কাস্টমস বিভাগের এক সিনিয়র অফিসার জানালেন আমি যেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরের পদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করি। কেননা তৎকালীন গভর্নর জনাব সেগুপ্তা বখশ চৌধুরী তাকে আমার ব্যাপারে বলেছেন, আমি যেন হজ্ব থেকে ফিরে এসেই তার সাথে দেখা করি। তার সাথে আলাপ না করে আমি যেন কোনো সিদ্ধান্ত না নেই। তবে আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমিই শুধু জানতাম। এটা কাউকে প্রকাশ করিনি। আমি ক্ষেপে গেছি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে জয়েন করব না একথা কাউকে বলিনি। ফেরার পরের দিনই আমি সেগুপ্তা বখশ চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এর একটি কারণও ছিল যে তিনি আমার একজন অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন, সৎ অফিসার ছিলেন। তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তার অধীনে আমি বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করেছি। তার সঙ্গে আমার একটা হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল। আমি তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তিনি আমাকে বোঝান যে কেন ডেপুটি গভর্নর হিসেবে জয়েন করলে আমার ভালো হবে। আমি তার কথা মেনে নিয়ে দুইদিন পর বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে যোগ দেই। তখন বাংলাদেশ ব্যাংকে আরো দু'জন ডেপুটি গভর্নর ছিলেন। নিয়ম ছিল দু'জন ডেপুটি গভর্নর হবে বাংলাদেশ বাংকের ভিতর থেকে আর একজন ডেপুটি গভর্নর সরকার পাঠাবে। আমি সকার মনোনীত ডেপুটি

গভর্নর ছিলাম। নিয়ম আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড অব গভর্নসের একজন সদস্য নিযুক্ত হয় ডেপুটি গভর্নর থেকে। সরকার আমাকে বোর্ডেরও প্রতিনিধি নিয়োগ করে।

ডেপুটি গভর্নর হিসেবে দু'টি বিভাগ আমার দায়িত্বে পড়ে। ব্যাংকিং রেগুলেশন অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর যে নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এটা তার মধ্যে একটি। সেন্ট্রাল ব্যাংকের দু'টি দায়িত্বের মধ্যে ব্যাংকিং রেগুলেশন একটি এবং অন্যটি হচ্ছে মনিটরি পলিসি অপারেশন। আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকাকালীন সময় বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু আভ্যন্তরীণ সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সেসব কারণে এক পর্যায়ে আমাকে প্রশাসনের দায়িত্ব দেয়া হয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বও আমাকে দেয়া হয়। অর্থাৎ বলা যায় শেষ দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রায় অর্ধেকের উপর কাজ আমার উপর অর্পিত হয়েছিল। আমার উপর আরেকটি বড় দায়িত্ব আসে। তখন 'ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর রিফর্ম প্রোগ্রাম' নামে একটি প্রোগ্রাম ছিল। এটাকে সংক্ষেপে এফএসআরপি বলা হয়। সেটা সরকারের সঙ্গে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চুক্তির আওতায় চলছিল। এক পর্যায়ে আমাকে তার প্রোজেক্ট ডাইরেক্টরের দায়িত্ব নিতে হয়। সব মিলিয়ে আমি ব্যাপক দায়িত্ব পাই।

বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকা অবস্থায় আমি যেসব কাজ করতে পেরেছিলাম তার ফল আমি মনে করি, দেশের জন্য অনেক ভালো হয়েছে। একটি কাজ আমি ইসলামী ব্যাংকের জন্য করি। এর জন্য ব্যাংকিং আইন সংস্কার করি যাতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য যেসব প্রতিবন্ধক ছিল সে আইনে তা দূর হয়ে যায়। যেমন আইনে ছিল কোনো ব্যাংক কোনো ব্যবসা করতে পারবে না। কিন্তু আমরা সেখানে একটি শর্ত যোগ করি যে, ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে এ ধারা প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ তারা ব্যবসা করতে পারবে। তেমনিভাবে অন্যান্য ধারার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে দেই। ঐ সময়ই আমরা আরো দু'টি ইসলামী ব্যাংকের জন্য অনুমতি দেই। এর জন্যও আমি বিশেষভাবে চেষ্টা করি যাতে আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক খোলার জন্য লাইসেন্স পেতে পারে। সোসাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ও আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক সে সময় লাইসেন্স পায়।

ব্যাংকিং সেক্টরের সার্বিক সংস্কারের ক্ষেত্রে আইনগত যেসব বিষয় ছিল তার মধ্যে একটা হচ্ছে ঋণ শ্রেণীকরণ। ঋণ শ্রেণীকরণ যদি খুব ঢিলেঢালা হয় তাহলে ব্যাংকিংয়ের এর রোগ ভালো করে ধরা পড়ে না। কিন্তু এটা টাইট হলে ব্যাংকিং এর ঋণের ক্ষেত্রে রোগগুলো ধরা পড়ে। সে জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চাপ ছিল যাতে ঋণের শ্রেণীকরণের তৎকালীন পদ্ধতিকে আমরা যেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাই। এ ব্যাপারে ব্যাংকিং সেক্টরের লোকদের নানারকম দ্বিধা ছিল, বাঁধা ছিল। কেননা এরকম একটি শক্ত ঋণ শ্রেণীকরণ নীতি আমাদের করা উচিত কি না, আমরা পারব কি না তাতে সন্দেহ ছিল। নানা কথা ছিল। নানা প্রশ্ন ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি নিজে সার্বিক বিবেচনায় দেখলাম যে একে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াই ভালো হবে। তবে ৩/৪ বছরের সময় নিয়ে একাজ করতে হবে। আমরা অবশেষে সেই দুর্বল ঢিলেঢালা শ্রেণীকরণ পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করে আন্তর্জাতিক নীতিই গ্রহণ করি এবং এই সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা ক্রমান্বয়ে এটাকে শক্ত করব। এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রায় চার বছরের সময় নির্ধারণ করি। আমি ৯৫ এর শেষে ব্যাংক থেকে চলে আসি এবং ৯৬-৯৭ এটা পুরোপুরি কার্যকর হয়। বর্তমান সময় এসে দেখা গেছে তা এখনও বলবৎ আছে। এতে ব্যাংকের স্বাস্থ্য প্রকৃতপক্ষে কত খারাপ তা আগের পদ্ধতিতে বর্তমানের মতো এতো ভালো করে বোঝা যেত না। এখন সহজেই তা বোঝা যায়। এখন যদি শ্রেণীকরণ ঋণের পরিমাণ ১০% এর কথা বলা হয় এর মানে দাঁড়ায় এটা টাইট হওয়ার কারণে ১০%। অথচ আগের হিসাবে এটা হতো ২%। অর্থাৎ আগে খারাপের পরিমাণ ও প্রকৃত বোঝা মুশকিল ছিল। আগে বিভিন্ন ব্যাংকের যে ৩৫%, ৩৬% ঋণ ছিল সেটা প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশি ছিল যা আজকের হিসেবে ৭০%, ৭৫%। আজকে যদি আমরা বলি এটা ২০% বা ২৫% এ নেমে এসেছে তাহলে বলতে হবে তা আগের তুলনায় অনেক ভালো অবস্থা। সুতরাং বলা যায় ব্যাপকভাবে ঋণের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কাজগুলো সবই হচ্ছে ফাইন্যান্স সেক্টর রিফর্ম প্রোগ্রামের আওতায়।

আগে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর ক্যাপিটাল রাখা হতো দায় (liability) ভিত্তিক। অর্থাৎ এত টাকা ডিপোজিট হলে এত পারসেন্ট রাখতে হবে। কিন্তু আমরা এটাকে আন্তর্জাতিক নিয়মে নিয়ে গেলাম। আমরা তাতে এসেট ভিত্তিক অর্থাৎ ঋণ ভিত্তিক, ঋণের ঝুঁকি দেখে কোনটা কি রকম সেই ভিত্তিতে করি। এটকে বলা হয় রিস্ক ওয়েটেড ক্যাপিটাল এডিকুয়েসি অর্থাৎ রিস্কের মান, পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক তার ভিত্তিতে ক্যাপিটাল বা পুঁজি রক্ষা করা। এটাও আমাদের ব্যাংকিং এর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়ার আরেকটি প্রচেষ্টা ছিল। এই সময় আমরা ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো

করি। ব্যাংক ঋণ দিত অথচ তারা জানত না তাদের পার্টির সার্বিক স্বাস্থ্য কেমন। সে কোন ব্যাংক থেকে কত ঋণ নিয়েছিল। তখন সিস্টেম ছিল একটি ব্যাংক অন্য দশটি ব্যাংকের কাছে লিখত, পার্টি সম্পর্কে জানতে চাইত। এতে সময় লাগত, কেউ উত্তর দিত কেউ দিত না। এরকম পরিস্থিতির ফলে তারা ভালো করে জানতে পারত না, এতে অনেক সময় ব্যাংকগুলো ভুল সিদ্ধান্ত নিত।

সিদ্ধান্ত হলো ক্রেডিটের জন্য একটি ইনফরমেশন ব্যুরো হবে। সেখানে সকল পার্টি কি কি ঋণ নিয়েছে সেই তথ্য দেবে। তা কম্পিউটারে রক্ষিত হবে। এটা সেন্ট্রাল ব্যাংকে রক্ষিত হওয়ার কারণে যে কোনো ব্যাংক চাইলে তাকে সেন্ট্রাল ব্যাংক তথ্য সরবারহ করবে। আমাদের সময় সিদ্ধান্ত ছিল আমরা এক বা দুই দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেব। আমি এটা গভর্নরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে করি। কিন্তু বিভিন্ন পার্টির পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রী অভিযোগের সম্মুখীন হলেন। পলিটিক্যাল লেবেলে তারা অনেক সময় ঘাবড়ে যান কিন্তু এটা আমি তাদেরকে বোঝাই। বিভিন্ন রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে গভর্নর সাহেবও তখন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের যুক্তি ন্যায়সঙ্গত ছিল। শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রচেষ্টায় এটা টিকে গেল। আর এটা যে দেশের জন্য, ব্যাংকের জন্য কত ভালো হয়েছে তা আজকের ব্যাংকাররা উপলব্ধি করছেন। কিন্তু তখন আমি ঘাবড়ে গেলে হয়ত বিষয়টি অন্য রকম হলেও হতে পারত।

বর্তমানে বিআইবিএম ব্যাংকিং ম্যানেজমেন্টের উপর যে মাস্টার্স ডিগ্রী দিচ্ছে সেটাও আমার সময় একটা প্রস্তাব ছিল যে এমবিএ ডিগ্রীর বাইরে ব্যাংকিং এর উপর একটা কোর্স ওপেন করা উচিত। সে প্রস্তাব ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ছিল। সেটা আমি সর্বান্ধকরণে সমর্থন করি এবং কার্যকর করার চেষ্টা করি। কিন্তু ভিতরে বাইরে এর খুব বিরোধীতা ছিল। এক পর্যায়ে আমি যখন ব্যাংকিং সেক্রেটারি হই তখন এটা অনুমোদন করি। সুখের কথা যে সেটাও সুন্দর ভাবে বাস্তবায়ন হয়ে গেছে।

এ সময় আমরা আরেকটি বড় কাজ করি যেটা সব সময়ই করা উচিত ছিল, সেটা, হলো রিস্ক এনালাইসিস। এটাকে লেন্ডিং রিস্ক এনালাইসিস বা ক্রেডিট রিস্ক এনালাইসিস দুই ভাবেই বলা হয়। ক্রেডিট যে দেয়া হচ্ছে তার রিস্ক ফ্যাক্টর কতটুকু তা এর মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়। এফএসআরপির যে দশ বারো জন বিদেশী আমার সাথে কাজ করছিল তারা তার একটা ফরমেট তৈরি করে। সেটা প্রথমে আমরা ন্যাশনালাইজড ব্যাংকগুলোতে কার্যকর করি। যদিও এটা এফএসআরপির প্রোজেক্টে ছিল না তা সত্ত্বেও আমি নিজে প্রাইভেট সেক্টরের ব্যাংকগুলোকে লিখি এবং এটাকে কার্যকর করতে বলি। এর ফলে একটি সিস্টেমেটিক ফরমুলা করে বাধ্য করে দেয়া হলো। এটা ব্যাংকগুলো করতে বাধ্য। এর ফলে ব্যাড লোন বা কু-ঋণ নিয়ন্ত্রণে একটি নতুন হাতিয়ার বা নতুন অস্ত্র পাওয়া গেল।

এ রকম কাজ ছাড়াও আরো ছোট বড় অনেক ধরনের কাজ করি। তবে প্রশাসনের যখন দায়িত্ব পেলাম সেটা আমার জন্য খুবই দুঃখজনক ছিল। সেখানে সাধারণ ইস্যুগুলো তো আছেই। সবগুলো কাজ আমি সাধ্যমত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা হলো অফিসার সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে। আমার বাংলাদেশ ব্যাংকের স্মৃতির কথা যখন মনে হয় তখন আমার বেদনার দিকগুলো ভেসে ওঠে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে আমার সম্পর্কিত দিকটি। তাদের অসম্ভব চাপ এবং অন্যায় চাপ সব সময় লক্ষ্য করেছি। তারা দৈনিক এসে দেখা করতে চাইতো। ট্রেড ইউনিয়নের লোকজন নিজেরা কোনো কাজ করবে না। সারাদিন ঘুরে বেড়াবে। তাদেরকে টেবিলের কোনো দায়িত্ব দেয়া যাবে না। তাদেরকে বদল করা যাবে না। উপরন্তু তারা বিভিন্ন জনের পক্ষে বিভিন্ন রকমের বদলির জন্য চাপ দেবে। তাদের দৃষ্টিতে যে লোক ভালো সেই কেবল ভালো, যে মন্দ সে মন্দ। তাদের সেই দৈনিক চাপের সামনে এখন কি করতে পারতাম জানি না তবে তখন সব সময় ডিপ্লোমেসি করতাম। কিছুটা কাজ করে দিতাম। কিছুটা বোঝাবার ব্যবস্থা করতাম। সার্বিক বিবেচনায় আমি এভাবেই চলেছি। কিন্তু এটা আমার জীবনে একটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক দিক।

শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট অত্যন্ত সঠিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট বিশ্বব্যাপীই অবনতিশীল হয়ে যাচ্ছে। তবে হতে পারে আমাদের দেশে একটু বেশি। সবখানেই এর একটা পতন ঘটেছে। এর মধ্যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড আমি দেখি না। কোনো নৈতিক মান দেখি না। অন্তত বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা আমার তাই বলে। এ ব্যপারে কি করা যায় তা দেশের রাজনৈতিক দল, শ্রমিক দলগুলোকেই চিন্তা করা উচিত। অফিসারদের দেখেছি তারা শুধু পোস্ট বাড়াতে চায়, প্রোমোশন চায়। উপরের দিকে পোস্ট সৃষ্টি করতে বলে।

কিন্তু ব্যুরোক্রেসি বড় হচ্ছে কিনা, ব্যাংকের খরচ বাড়ছে কিনা বা প্রতিষ্ঠান নষ্ট হচ্ছে কিনা সেসব দিকে কোনো খেয়াল তাদের নেই। এই ধরনের পরিস্থিতি আমার সামনে ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকে জয়েন করার কয়েক মাস পরেই গভর্নর হয়ে আসেন খোরশেদ আলম সাহেব। তার সাথে আমার খুবই সুসম্পর্ক ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে শুরুটা আমার ভালো হয়নি। তিনি যখন জয়েন করলেন আমরা তাকে রিসিভ করলাম। কিন্তু আমার মনে হয় কেউ না কেউ তাকে আমার সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা দেয়ায় শুরুতেই তিনি আমার উপর কেন যেন সন্দেহের দৃষ্টি রাখতেন। অথচ আমি যখন রাজস্ব বোর্ডে ছিলাম তখন তিনি আমার কামরায় এসেছেন। আমি উনাকে সাধ্যমতো সাহায্য সহযোগিতা করেছি। তিনি যখন বাণিজ্য সচিব হন তখন আমি তার কাছে গিয়েছি। তিনি আমার সাথে যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ঠিক সেন্ট্রাল ব্যাংকে আসার আগে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মিস ব্রিফিং এর কারণে আমার প্রতি উনার সন্দেহ ছিল বলে মনে হয়েছে। কেউ হয়ত তাকে আমার সম্পর্কে মিস ব্রিকিং করে থাকবে। তবে তার এই ভুল বোঝা শেষ পর্যন্ত আর থাকেনি। আমি আমার ব্যবহার, কাজ দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে প্রমাণ করি যে আমি একজন লয়াল অফিসার। আমি কোনো বসের জন্য কোনো সমস্যা নই। পরে তিনি নিজেই সকল দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দেন। পরবর্তীতে আমি যখন ব্যাংকিং সেক্রেটারি হই তিনি তখনও গভর্নর। তখন আমাদের মধ্যে যথেষ্ট সুসম্পর্ক ছিল। যদিও আমার সময়ই উনাকে মেয়াদের আগেই গভর্ণর পদ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তবে সেটা ছিল অর্থমন্ত্রী এবং তাদের মধ্যেকার ব্যাপার। আমাকে সেখানে শুধু একটা দায়িত্বের অংশ হিসেবে কিছু কাজ করতে হয়েছিল মাত্র।

(অনুলিখন ও সম্পাদনায় : ওমর বিশ্বাস)